৪২ কোটি টাকার গণগ্রেপ্তার বাণিজ্য

তিন দফায় ৪২ হাজার মানুষ গ্রেপ্তারের শিকার হয়েছেন। সরকারের উদ্দেশ্য বিরোধী আন্দোলন ঠেকানো হলেও পুলিশ এটাকে নিয়েছে বাড়তি রোজগারের সুযোগ হিসেবে। বিনা দোষে গ্রেপ্তারের পর আবার এই অসহায় মানুষগুলোকে ছাড়া পেতে হয়েছে পাঁচ থেকে বিশ হাজার টাকা খরচ করে।

wi‡cvU e`i“j Avjg bwej I †gv¯—dv mv‡ivqvi wepe

হাজি মোক্তার হোসেনের বয়স ৫০ ছাড়িয়ে গেছে। শ্যামপুরের দনিয়া এলাকায় তিনি ধনাঢ্য ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। ওই এলাকায় তার সাতটি বাড়ি ছাড়াও রয়েছে ভাই ভাই ট্রেডার্স নামে একটি বড় সিমেন্টের দোকান। গত ২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার মাগরিবের নামাজ পড়ে বাসায় ফেরার পথে শ্যামপুর থানার এসআই নীরব তাকে গ্রেপ্তার করেন। থানায় নিয়ে যাওয়ার পর তিনি দেখেন, লকারে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। আরো অসংখ্য পথচারীকে ধরে আনা হয়েছে। শুরু হয় এসআই নীরবের সঙ্গে হাজি মোক্তারের লেনদেনের দরকষাকষি। চাহিদামতো টাকা না দেওয়ায় তাকে ডিএমপির অধ্যাদেশে (গণগ্রেপ্তার) চালান না দিয়ে তিন মাস আগের একটি পেনডিং ডাকাতির মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে ফরওয়ার্ডিং দিয়ে কোর্টে পাঠায়। অনুসন্ধানে জানা গেছে, মোক্তার হাজিকে গণগ্রেপ্তারের আওতায় ধরা হলেও তাকে পরবর্তীতে ডাকাতি মামলার আসামি করা হয়েছে স্রেফ পুলিশকে টাকা না দেয়ার কারণে। পাশাপাশি ৪ ফেব্রুয়ারি কোর্ট তার জামিন মঞ্জুর করলেও তাকে জেলহাজত থেকে ছাড়া হয় লংমার্চ শেষ হওয়ার পরের দিন (৬ ফেব্রুয়ারি)। হাজি মোক্তার হোসেন ২০০০-কে বলেন, 'জীবনে থানায় তার নামে একটি জিডি পর্যন্ত নেই। কিন্তু আমি আজ ডাকাতি মামলার আসামি।' তিনি আরো বলেন, তাকে যেই ডাকাতি মামলার আসামি করা হয়েছে, সেই মামলার এজাহারে কোনো আসামির নামই উল্লেখ নেই। এ ব্যাপারে এসআই নীরব বলেছেন ভিন্ন কথা। তিনি ২০০০-কে বলেন, হাজি মোক্তারকে ডাকাতি মামলায় জড়ানোর ব্যাপারে তিনি সম্পৃক্ত নন।

২. মুরাদপুর এলাকার একটি পিতলের কারখানার শ্রমিক কামাল হোসেন। নববিবাহিত স্ত্রী লায়লাকে মাসখানেক আগে ঢাকায় নিয়ে এসেছেন। এর মধ্যে গত ১ ফেব্রুয়ারি বুধবার সন্ধ্যায় জুরাইনের মুরাদপুর এলাকা থেকে কামালকে শ্যামপুর থানা পুলিশ গ্রেপ্তার করে। লায়লা পরে এক মহাবিপদে। এখনো ঢাকার কিছুই সে চিনে উঠতে পারেনি। ঢাকায় কামাল বা তার নিজের কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। হাতে কোনো টাকা-পয়সাও নেই যে, গাড়িভাড়া দিয়ে থানায় গিয়ে খোঁজ-খবর নেবে। শেষ পর্যন্ত কারখানা মালিকের সহযোগিতায় ৬ ফেব্রুয়ারি জামিনে বের হয় কামাল। দুঃসহ ৫টি দিন কীরকম আতঙ্কে কেটেছে এই কিশোরীবধূর, তা বলাই বাহুল্য। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কামালের এই মামলায় সর্বমোট খরচ হয়েছে সড়ে ৪ হজার টাকা। পুরো টাকার খরচ বহন করেন কারখানার মালিক। এই টাকা মাসিক কিস্তির মাধ্যমে বেতন থেকে কেটে রাখবেন তার মালিক।

৩. তেজগাঁও রেলওয়ে কলোনির পাশের বস্তির বাসিন্দা মর্জিনা বেগম। রেলস্টেশনের পিঠা বিক্রেতা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে বেশ আগেই। সংসারে দুই ছেলে, এক মেয়ে। স্বামী পরিত্যক্তা মর্জিনা পিঠা বিক্রি করে জীবন নির্বাহ করেন দীর্ঘদিন থেকে। গত ১ ফেব্রুয়ারি তেজগাঁও থানা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে বড় ছেলে মিনহাজ। থানায় অনেক দেনদরবার করে শেষ সম্বল পিঠা ব্যবসার পুঁজি ১ হাজার টাকা পুলিশের হাতে দিয়ে ছেলেকে ছাড়িয়ে আনেন। জীবন সংগ্রামের শেষ সম্বল হারিয়ে পরিবারটি অসহায়। ১৪ বছরের মিনহাজ নিজেও জানে না পুলিশ তাকে কেন গ্রেপ্তার করেছিল। থানায় গিয়ে শুনেছে, সে নাকি আওয়ামী লীগ সমর্থক। লংমার্চ উপলক্ষে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আসলে লংমার্চ যে কি তাই সে বোঝে না।

৪. টঙ্গীর পূর্ব আরিচপুরের রতন আলী। সানরাইজ গার্মেন্টস কর্মী। প্রতিদিনের কাজ সেরে গত ৩ ফেব্রুয়ারি বাসায় ফেরার সময় টঙ্গী থানা পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। গ্রামের বাড়িতে অসুস্থ পিতা। তাই মা জাহানারা বেগম বাড়িতে টাকা পাঠাতে বারবার তাগাদা দিচ্ছেন। সে ঠিক করলো শুক্রবার ওভার ডিউটি না করে বাবাকে দেখে আসবে। তার আর অসুস্থ বাবাকে টাকা দিতে যেতে হয়নি। বেতনের টাকার ১৫০০ টাকা চলে গেছে পুলিশের পকেটে। গার্মেন্টস কর্মী পরিচয়পত্র

বের করতেই পুলিশ কনস্টেবল খেকিয়ে ওঠে। গার্মেন্টসে চাকরি তার আবার পরিচয়! 'শালা আরিচপুরের গাঁজা ব্যবসায়ী।' এক সময় বেতনের টাকা নিয়ে পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়। রতন আলী জানে না বাবার চিকিৎসা হবে কি না।

৫. গণগ্রেপ্তারের কারণে আজ চাকরিহারা সায়েদাবাদ বাস কাউন্টারের যুবক শামীম।

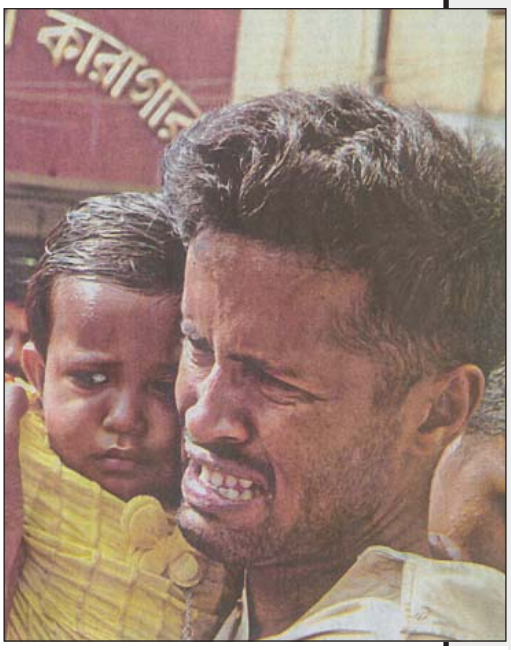

wbev †`v‡l 4 w`b Kvivi‡fv‡Mi ci mš—v‡bi mvwb‡a¨ g³ wcZvi আবেগাপ্লুত µ›`b

গত ৩ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বিকেলে ডেমরা থানা পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। তার সংসারে একমাত্র আয়ের উৎস শামীম। ছেলের গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে মা সখিনা বেগম কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। জামিনের জন্য উকিল চান ৫ হাজার টাকা। ঘরে ভাত নেই, তারপরও ধারকর্য করে মা সখিনা বেগম ৩ হাজার টাকা উকিলের হাতে তুলে দেন। বাকি টাকা আগামী হাজিরার দিন দিতে হবে- এই শর্তে উকিল সোমবার তার জামিনের ব্যবস্থা করেন। পাশাপাশি পরবর্তী হাজিরার দিন বাকি ২০০০ টাকা না নিয়ে গেলে জামিন বাতিল করার হুমকিও দেন উকিল। এদিকে শামীমের তিন দিনের অনুপস্থিতির কারণে অন্য একজনকে চাকরি দিয়ে দেয় মালিকপক্ষ। একদিকে কর্যের টাকা পরিশোধের চাপ, অন্যদিকে নতুন একটি চাকরির আশায় দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে শামীম। শামীমের মতো এরকম অনেককেই ডেমরা থানা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

৬. মা রেবেকা বেগম বিভিন্ন বাসায় ঝিয়ের কাজ করেন। পাশাপাশি ছেলে হাসান বনগ্রাম রোডে লেদ মেশিনের অপারেটর। অভাব-অনটনের মধ্যেও মাকে নিয়ে পিতৃহীন হাসানের সংসার। ৩ ফেব্রুয়ারি জুমার নামাজ পড়ে বাসায় যাওয়ার পথে সূত্রাপুর থানা পুলিশ কর্তৃক সেও গণগ্রেপ্তারের শিকার হয়। মালিকের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে ছেলের জামিনের ব্যবস্থা করেন। গত ৬ ফেব্রুয়ারি সোমবার মোট ৪ হাজার টাকার বিনিময়ে উকিল তার জামিনের ব্যবস্থা করেন। হাসানের মতো আরো অনেকে এ থানার পুলিশের গণগ্রেপ্তারের শিকার হয়।

এভবেই গত ১ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজধানীর ২৮ থানার দুই সহস্রাধিক পুলিশ গণগ্রেপ্তারের প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। এরকম গণগ্রেপ্তারের কারণ, দুদিন পর বিরোধী দলের লংমার্চ এসে পৌঁছাবে ঢাকায়। গ্রেপ্তারের ভয়ে মানুষ যাতে বিরোধী দলের এই সমাবেশে না আসে। সরকারের উদ্দেশ্য বিরোধী আন্দোলন ঠেকানো হলেও পুলিশ এটাকে নিয়েছে বাড়তি রোজগারের সুযোগ হিসেবে। যেন কার চেয়ে কে বেশি নিরীহ মানুষ গ্রেপ্তার করতে পারে এবং তাদের কাছ থেকে কে কত বেশি টাকা আদায় করতে পারবে এটাই প্রতিযোগিতা। এবারের গণগ্রেপ্তারে পুলিশ দেখিয়েছে, রাজধানী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২ হাজার ৪৩৯ জন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে গ্রেপ্তার হয়েছে আরো অনেক বেশি। এই গণগ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দায়ের করা রিট মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবী ব্যারিস্টার তানজীব-উল আলম সাপ্তাহিক ২০০০-কে জানিয়েছেন, তাদের হিসাবমতে, এবার সারা দেশে ৮ হাজারের মতো মানুষ গণগ্রোপ্তারের শিকার হয়েছে। এই গণগ্রেপ্তার প্রতিযোগিতা সম্প্রতি হয়েছে আরো দুবার। ব্যারিস্টার তানজীব জানিয়েছেন, 'গত ২২ নভেম্বর পল্টনে ১৪ দলের মহাসামাবেশ ঠেকানোর জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ১৪ হাজারের বেশি নিরীহ মানুষকে। তারও আগে ২০০৪ সালের ৩০ এপ্রিল আওয়ামী লীগের সরকার পতনের ডেডলাইনকে কেন্দ্র করে

থানায় থানায় গ্রেপ্তার উৎসব

শ্যামপুর থানা সূত্রে জানা যায়, ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ৬৩ জনকে ডিএমপির অধ্যাদেশের বিভিন্ন ধারায় কোর্টে চালান দেয়া হয়। অনুসন্ধানে জানা গেছে, ৬৩ জনকে গণগ্রেপ্তারের আওতায় কোর্টে পাঠালেও এ থানায় চার দিনে গ্রেপ্তারের সংখ্যা ১০৫। বাকিদের ডাকাতি, চাঁদাবাজি ও চুরির মামলাসহ বিভিন্ন ধারায় চালান দেয়া হয়। দাবি মতো পর্যাপ্ত টাকা না দিলেই পুরনো কোনো মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়েছে পুলিশ। এ থানায় ডিএমপির অধ্যাদেশের ধারায় গ্রেপ্তারকৃত শ্যামপুর থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা শাহীন বলেন ভিন্ন কথা। তিনি ২০০০-কে বলেন, গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে অনেককে আবার শনিবার কোর্টে পাঠানোর আগেই থানা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। এ ধরনের সব অভিযোগ অস্বীকার করেন শ্যামপুর থানার ওসি মজিবুর রহমান মজুমদার। তিনি ২০০০-কে বলেন, 'যাদের ধরা হয়েছে, এদের প্রত্যেককেই কোর্টে চালান দেয়া হয়।' টাকার বিনিময়ে কাউকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে-এ ধরনের অভিযোগ তিনি সরাসরি অস্বীকার করেন।

গণগ্রেপ্তার কী আমরা তা বুঝি না। এরা বিভিন্নভাবে অপরাধী, পুলিশের কাজে প্রতিবন্ধকতাকারী। সে কারণেই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এক বাক্যে উপরোক্ত কথাগুলো বললেন ডেমরা থানার সেকেন্ড অফিসার আক্তারুজ্জামান। অথচ সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, এবারে লংমার্চ উপলক্ষে পরিচালিত গণগ্রেপ্তারে ডিএমপির ২৮টি থানায় সর্বমোট ২ হাজার ৪৩৯ জনকে ডিএমপির বিভিন্ন অধ্যাদেশে কোর্টে চালান করলেও এর মধ্যে মাত্র দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পুলিশের কাজে বাধা দেয়ার অভিযোগে। আর ডেমরা থানা পুলিশ এ অভিযোগে একজনকেও গ্রেপ্তার করেনি। একাধিক সূত্রে জানা যায়, উক্ত থানা পুলিশ যে হারে গণগ্রেপ্তার করেছে, এর চার ভাগের এক ভাগ কোর্টে পাঠায়, বাকিদের লেনদেনের মাধ্যমে থানা থেকেই ছেড়ে দেয়। আবার আসল আসামিকে গ্রেপ্তার করেও পরিমাণমতো উৎকোচ পেয়ে গণগ্রেপ্তার বলে চালিয়ে দিয়েছে। যেমন কোনাপাড়া এলাকার খুচরা ফেনসিডিল বিক্রেতা কাজলকে সিভিল টিমের দারোগা সায়ের ১০ বোতল ফেনসিডিলসহ গ্রেপ্তার করেন। তাকে থানা থেকেই ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য এ থানার সোর্স শাহিন মাদক ব্যবসায়ীর পক্ষ হয়ে সেকেন্ড অফিসার আক্তারুজ্জামানের সঙ্গে লেনদেনের রফাদফা করেন। শেষ পর্যন্ত ১৭ হাজার টাকার বিনিময়ে কাজলকে ৫৪ ধারায় চালানের মাধ্যমে গণগ্রেপ্তার বলে চালিয়ে দেয়া হয়। এ ব্যাপারে আক্তারুজ্জামান ২০০০-কে বলেন, 'কাজল ফেনসিডিলসহ ধরা পড়েছে কি না তা একমাত্র সেই দারোগাই বলতে পারবেন, যিনি তাকে

ধরেছেন।' থানা সূত্রে জানা গেছে, ডিএমপির অধ্যাদেশের বিভিন্ন ধারায় ৫৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পাশাপাশি সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, গ্রেপ্তারের সংখ্যা ১৪২, বাকিদের বিভিন্ন মামলায় চালান দেয়া হয়েছে।

সূত্রাপুর থানার ওসি আওলাদ হোসেন পিপিএম ২০০০-কে বলেন, 'প্রকৃত পক্ষে এটাকে গণগ্রেপ্তার বললে ভুল হবে। কারণ যাদেরকে ডিএমপির অধ্যাদেশে কোর্টে চালান দেয়া হয়েছে, এদের দ্বারা আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে। কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে তারা গ্রেপ্তার করিনি।' তিনি বলেন, তার থানা এলাকা থেকে আনুমানিক শ'খানেক ব্যক্তিকে ডিএমপির বিভিন্ন অধ্যাদেশে চালান দেয়া হয়েছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, মোট ৫৭ জনকে এ থানা থেকে গণগ্রেপ্তারের আওতায় কোর্টে পাঠানো হয়েছে।

লালবাগ থানা সূত্রে জানা যায়, মোট ২৪৭ জনকে ডিএমপির বিভিন্ন অধ্যাদেশে কোর্টে চালান করা হয়। পাশাপাশি কামরাঙ্গীরচর থানা পুলিশ মোট ২৯ জনকে ডিএমপির বিভিন্ন অধ্যাদেশে চালান করে। রমনা ও মতিঝিল থানা এলাকা থেকে ডিএমপির অধ্যাদেশে চালানের সংখ্যা যথাক্রমে ৫৮ ও ৩৮ এবং কোতোয়ালি থানায় গণগ্রেপ্তারের সংখ্যা ৩২। অনুসন্ধানে জানা গেছে, উপরোক্ত তিন থানায় গ্রেপ্তারের সংখ্যা আরো অধিক। ডিএমপি অধ্যাদেশের বাইরে যাদের চালান দেয়া হয়, তাদের গণগ্রেপ্তারের আওতায় আনা হয়নি। অন্যদিকে সবচেয়ে কম গণগ্রেপ্তারের সংখ্যা বিমানবন্দর থানায়। মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৭। কিন্তু এ থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই শাহজাহান ২০০০-কে বলেন, এ থানায় কোনো গ্রেপ্তার হয়নি।

উত্তরা থানার রেকর্ড অনুসারে ১ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৫৪ ধারা এবং ডিএমপির ৮৪ ধারায় ১১১ জনকে আদালতে চালান করা হয়েছে। তবে অভিযোগ পাওয়া গেছে, উত্তরা থানার সিভিল টিমের এসআই গিয়াস উদ্দিন, এসআই জলিল, ডিবির এসআই ফরিদ, উত্তরখান এবং দক্ষিণখান এলাকায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও নিরীহ সাধারণ মানুষকে ধরে ৫ থেকে ২০ হাজার টাকা উৎকোচ নিয়ে তাদের ছেড়ে দিয়েছে। তুরাগ থানার রেকর্ড অনুসারে একই সময় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১১৭ জনকে। গণগ্রেপ্তারের সময় নিরীহ মানুষকে আটকের পর উৎকোচের বিনিময়ে তাদের অনেককেই ছেড়ে দেয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে এই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হেলাল বলেন, 'এ ধরনের কোনো ঘটনা এখানে ঘটেনি। রাজধানীর মিরপুর থানার ওসি এমএ রব বলেন, '১ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আনুমানিক ১৬০ জনকে গ্রেপ্তারের পর কোর্টে চালান করা হয়েছে। গণগ্রেপ্তার সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি আরো বলেন, 'গণগ্রেপ্তার কী জিনিস আমি বুঝি না। যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা সবাই নিয়মিত মামলার আসামি। একই সময় পল্লবী থানায় ২৭৫ জন, শাহ আলী থানায় ৭০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ দুটি থানার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গ্রেপ্তারকৃতরা নিয়মিত মামলার আসামি।

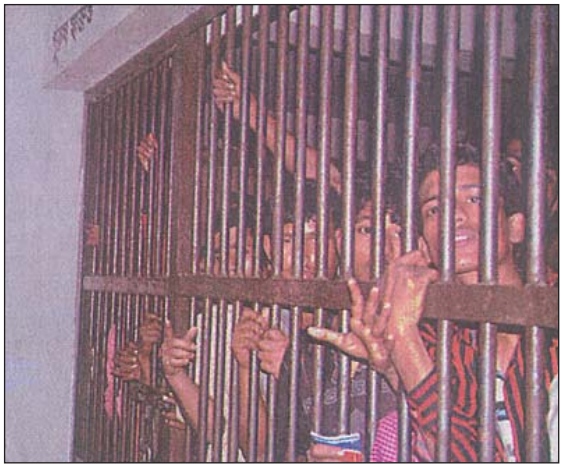

VvB bvB jKAv‡c...

গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ২০ সহাস্রাধিক।'

অনুসন্ধানে জানা গেছে, গণগ্রেপ্তারকৃত লোকদের কোন ধারায় কোর্টে চালান দেয়া হবে তা নিয়েই ব্যবসার ফাঁদ পেতেছিল পুলিশ। গ্রেপ্তারের পর যারা পুলিশের চাহিদামতো টাকা দিতে পেরেছে, তাদের সিংহভাগকেই গ্রেপ্তার না দেখিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। যারা কিছু টাকা দিয়েছে, কিন্তু প্রত্যাশামতো নয়, তাদের ডিএমপির অধ্যাদেশে চালান দিয়েছে। কিন্তু যারা টাকা দেয়নি বা সামর্থ্য না থাকায় টাকা দিতে পারেনি তাদের চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন তদন্তাধিন মামলার আসামি হিসেবে আদালতে চালান করেছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, গ্রেপ্তারকৃতরা ছাড়া পেতে পুলিশ যার কাছ থেকে যেরকম পেরেছে টাকা আদায় করেছে। এই অঙ্ক ২০ হাজার পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। তবে ৫ হাজারের কমে পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছে এমন কাউকে পাওয়া যায়নি। আর যদি কোর্টে চালান হয়ে থাকে, তবে কমপক্ষে ৪ হাজার টাকা তার চলে গেছে শুধু কোর্টের আনুষ্ঠানিক খরচ হিসেবে। এই খরচ মামলার ধারাভেদে ১০ হাজর থেকে ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়েছে কারো কারো। তবে আমরা গণগ্রেপ্তারের শিকার এমন একজনের সন্ধান পেয়েছি, যিনি আইনজীবীর সঙ্গে ১ লাখ টাকার চুক্তির ভিত্তিতে এক দিনের মধ্যে জামিন পেয়েছেন। তিনি একজন ধনবান ব্যবসায়ী, যাকে পুলিশ

এক রাতে গ্রেপ্তার ১২৭২

২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকায় গণগ্রেপ্তারের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ২৭২। পাশাপাশি থানা পুলিশ দাবি করছে, শুক্রবার সকাল ১০টা পর্যন্ত গ্রেপ্তারের সংখ্যা ১২৭২। এদেরকে শনিবার ডিএমপির বিভিন্ন অধ্যাদেশে আদালতে হাজির করা হয়। সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, গণগ্রেপ্তার নিয়ে আবার নাটকীয় ঘটনা ঘটায় ডিএমপির গুরুত্বপূর্ণ থানা মতিঝিল, ডেমরা, শ্যামপুর, সূত্রাপুর, কোতোয়ালি ও রমনা পুলিশ। উপরোক্ত থানা পুলিশ ৩ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সকাল দশটার পর থেকে কাউকে ডিএমপি অধ্যাদেশে কোর্টে হাজির করেনি। শুক্র ও শনিবার এসব থানায় যাদেরকে গণগ্রেপ্তার করা হয়, তাদের পুলিশের বহুল ব্যবহৃত ধারা ৫৪ এবং বিভিন্ন পেইনডিং মামলায় আদালতে হাজির করেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ডেমরা থানার ওসি মোঃ গাফফার, শ্যামপুর থানার মজিবর রহমান মজুমদার, সূত্রাপুর থানার আওলাদ হোসেন পিপিএম, মতিঝিল থানার আঃ মোতালেব, কোতোয়ালি থানার ওসি ওমর ফারুক, রমনার ওসি মাহবুব- এরা দীর্ঘদিন ধরে ঘুরেফিরে ডিএমপিতেই ওসির দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। সে কারণে তারা অনেক অপকর্মই কৌশলে চালিয়ে যান। যেমন তারা গণগ্রেপ্তার করলেও তা ফরোয়ার্ডিংয়ে দেখায় অন্য মামলা। শুধু বৃহস্পতিবার রাতে গণগ্রেপ্তারের মধ্যে রয়েছে ডেমরা ৫০, রমনা ৫৮, সূত্রাপুর ৫৭, শ্যামপুর ৬৩, মতিঝিল ৩৮, কোতোয়ালি ৩২, উত্তরা ২৭, ক্যান্টনমেন্ট ২৩, বিমানবন্দর ৭, গুলশান ৫০, বাড্ডা ৬৫, তেজগাঁও ৯১, কাফরুল ৮৪, মোহাম্মদপুর ৭৯, ধানমন্ডি ২৯, হাজারীবাগ ২৪, কামরাঙ্গীরচর ২৯, লালবাগ ৩৫, মিরপুর ৯০, খিলগাঁও ৫৭, সবুজবাগ ৪৫, নিউমার্কেট ১২, পল্লবীত ৬৯, শাহ আলী ৩৬, আদাবর ৪৯, খিলক্ষেত ২৪, পল্টন ১৯ ও তুরাগ থানা থেকে ৩০।

চালান করেছিল একটি সাজানো ডাকাতি মামলার আসামি করে।

প্রাপ্ত হিসাবমতে, তিনটি গণগ্রেপ্তারে সারা দেশে ৪২ হাজার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অন্যদিকে একেকজন গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি জামিন অথবা ছাড়া পেতে গড়ে ১০ হাজার টাকা খরচ করেছেন। এই হিসাবে অনুযায়ী গ্রেপ্তারের শিকার ৪২ হাজার মানুষের কাছ থেকে পুলিশ এবং নিম্ন আদালতের আইনজীবীরা ৪২ কোটি টাকা আয় করেছেন।

তিনটি গ্রেপ্তারেই লক্ষ করা গেছে, গ্রেপ্তারকৃতদের সিংহভাগ অত্যন্ত নিম্ন আয়ের সাধারণ দিনমজুর। মজুরি দিতে বের হয়েছেন অথবা মজুরি দিয়ে বাড়ি ফিরবেন পথ চেয়ে থাকা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বা বৃদ্ধ মা। পরিবারে উপর্যনক্ষম ব্যক্তিটি সারা দিন অমানুষিক পরিশ্রম করে ঘরে ফিরবেন তাদের জন্য খাবার নিয়ে। এসব পরিবার যখন শোনে, যাকে কেন্দ্র করে তাদের বেঁচে থাকা, সেই আপনজনটি বিনা অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছে, তখন পুরো পরিবার ছোট থেকে আরো ছোট হয়ে যায়। যা কিছু আছে শেষ সম্বল, তাই নিয়ে ছুটে যায় তাকে মুক্ত করতে। ধন ও সম্মান হারিয়ে গ্রেপ্তার হওয়া নিরীহ মানুষটি মুক্তি পেলেও জীবনের এক ক্ষত তাকে তাড়িয়ে ফিরবে সারাজীবন।

বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সভাপতি অ্যাডভোকেট মাহবুবে আলম ২০০০-কে বলেন, 'এরকম নিরপরাধ মানুষকে হয়রানি করা একটি ফ্যাসিজম, এটা কোনো সভ্য দেশে চলতে পারে না। সভ্য কোনো দেশে এরকম ঘটনা ঘটলে সরকার আর ক্ষমতায় থাকতে পারতো না। জনরোষের শিকার হয়ে তাকে বিদায় নিতে হতো। এখানকার মানুষ গরিব, ঠিকমতো খেতে পায় না। তাই এসব নিয়ে ভাবার সময় পায় না।'

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ, তাই এখানকার নাগরিকরাও স্বাধীন- এমনই মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু এ কেমন স্বাধীনতা, এ কেমন গণতন্ত্র? সাধারণ নিরীহ মানুষ উপার্যনের জন্য রাস্তায় নামলে তাকে গ্রেপ্তার করে হেনস্তা করা হবে শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে! রাজনীতিকদের ক্ষমতা দখলের রাজনীতির শিকার হয়ে আর কতো নিষ্পেষিত হতে হবে? এটা কেমন রাজনীতি? এ কেমন স্বৈরতান্ত্রিক গণতন্ত্র?

সহযোগিতা : **খোন্দকার তাজউদ্দিন** ও **খোন্দকার তানভির জামিল**

হিতে বিপরীত

কেউ গ্রেপ্তার হয়নি ডিএমপি অ্যাক্ট ৮৬ ধারায়

তিনটি মানবাধিকার সংস্থা দেশের নিরীহ মানুষকে গণগ্রেপ্তারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আদালতে রিট করেছিল। আদালতও এ ব্যাপারে সরকারকে কারণ দর্শাতে বলে। তাই এবারের গ্রেপ্তারগুলো পুলিশ আর ডিএমপি অ্যাক্ট ৮৬-তে (যে আইনের অধীনে এতদিন গণগ্রেপ্তার হয়ে আসছিল) কাউকে গ্রেপ্তার দেখায়নি। এবার নিরীহ মানুষগুলোকে ধরে এনে চুরি, ডাকাতি, ছিনতায়ের মতো জটিল মামলায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। যার ফলে গণগ্রেপ্তারের শিকার মানুষের হয়রানি আরো কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। তাই রিটকারী মানবাধিকার সংগঠনগুলো এখন আত্মগ্লানিতে ভুগছে।

১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি- এই চার দিনে ঢাকার ২৮টি থানা থেকে এজাহারবিহীন প্রসিকিউশনে মোট ২ হাজার ৪৩৯ জনকে পুলিশ আদালতে হাজির করে। ঢাকা মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশ ১৯৭৬-এর (ডিএমডিও) বিভিন্ন ধারায় এদের গ্রেপ্তার দেখানো হলেও ডিএমপি অ্যাক্ট ৮৬ ধারায় কাউকে গ্রেপ্তার দেখনো হয়নি। এই ধারার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে পিটিশন মামলা চলছে। ২০০৪ সালের ২৭ এপ্রিল বিচারপতি মোঃ আব্দুল মতিন ও বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমদের আদালতে চারটি সংস্থা একটি রিট পিটিশন মামলা করে। সংস্থাগুলো হলো আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ব্লাস্ট, কর্মজীবী নারী ও জাতীয় আইনজীবী পরিষদ। সেদিনই হাইকোর্ট এ ব্যাপারে রুল জারি করলেও পুলিশ এ ধারায় আবারও গ্রেপ্তার করে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ওই সংস্থাগুলো আবেদনের মাধ্যমে হাইকোর্টকে অবহিত করে। সে কারণেই এবারের গণগ্রেপ্তারের ৮৬ ধারায় একজনকেও পুলিশ চালান করেনি। পাশাপাশি চলতি মাসের ৫ ফেব্রুয়ারি জেডআই খান ৮৬ ধারার বিরুদ্ধে আরো একটি রিট পিটিশন মামলা দায়ের করেন। সেদিনই হাইকোর্ট রুল জারি করে- আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে ৮৬ ধারায় গ্রেপ্তারকৃতদের নাম-ঠিকানা শনাক্ত করে কোর্টকে অবহিত করার জন্য। ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, এ ধারায় কেউ ও গ্রেপ্তার হয়নি। এবার যেসব ধারায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে এর মধ্যে মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশ ৮৪ ধারায় ২৪১ জন, ৭৮ ধারায় ১৫১, ৭৭ ধারায় ৯৭২, ৭৬ ধারায় ১৬৯, ৭৫ ধারায় ৩০৫, ৭৪ ধারায় দুজন, ৬৯ ধারায় ৫০ জন, ৬৭ ধারায় দুজন এবং ৬৪ ধরায় একজন। এছাড়া গ্রেপ্তার করা হয়েছে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় ৫৪৫ জনকে এবং ১০৮ ও ১৫২ ধারায় দুজনকে।